http://www.elearninginfo.in

।। আগমনী ও বিজয়া ।।

● আগমনী ও বিজয়া গানের সাধারণ পরিচয় :

আগমনী ও বিজয়া শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কাব্যপর্যায়। শাক্তপদগুলি মূলত সঙ্গীত হলেও নাটকীয়তার ক্ষীণ সংলগ্ন-সূত্রে গ্রথিত মানবজীবননাট্যের দুই দৃশ্যসম্বলিত একাঙ্কিকার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আগমনী-বিজয়ার এই বিশেষ নাট্যরূপটি মনে রেখেই বোধকরি একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক আগমনী-বিজয়াকে 'drama of welcome and farewell বলেছেন। উমার পিতৃগৃহে আগমন থেকে বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত কাহিনী একটি নিটোল মিলন-বিরহের নাট্যগীতে পরিণত হয়েছে। পৌরাণিক শিব-উমার কাহিনীর সঙ্গে হর-গৌরীর লোকচেতনাজাত বাস্তব জীবনচিত্র মিশে নাট্যকাহিনীকে পরিপুষ্ট করেছে। "আগমনী গানের কাব্য-সৌন্দর্যে বৈচিত্র্যের এবং নাটকীয়তার অবকাশ আছে। মাতৃগৃহে কন্যা আনয়নের জন্য মাতার ব্যাকুলতা, স্বপ্নদর্শন, স্বামীর প্রতি কাতর অনুনয়, কন্যার দুর্ভাগ্যের সম্ভাব্য চিন্তায় অকারণ-উদ্বেগ, স্বামীর কৈলাসযাত্রা, পিতৃগৃহে আগমনের পূর্বে শঙ্করের নিকট উমার বিদায় প্রার্থনা, মাতা ও কন্যার প্রথম সাক্ষাৎ, মানাভিমান, আনন্দোল্লাস এ সবই আগমনী পর্যায়ের পরস্পর সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাবলীর মতো। এই দৃশ্যের চরম উৎকর্ষ বিজয়ায় অর্থাৎ বিজয়া আগমনী ব্যাপারেরই একটি সম্ভাবিত পরিণতি, পৃথক প্রতিস্পর্ধী বিষয়মাত্র নয়। সমস্ত ঘটনাটি বিজয়াকে গ্রহণ করেই মিলন বিচ্ছেদের এক নিত্যবেদনার বিয়োগান্তক নাটক। ফলে একোক্তির একাধিক বৈচিত্র্যে এবং স্থানবিশেষে যোজিত সংলাপে একটি ঘটমান দৃশ্যপটের নাট্যাভাস পাওয়া যায়।"[২]

আগমনী পর্যায়ের পদগুলির দুটি স্তবক। প্রথমটিকে পূর্ব-আগমনী এবং পরেরটিকে উত্তর-আগমনী বলা যেতে পারে। পূর্ব আগমনী পর্যায়ে দেখা যায় শরৎ ঋতুর আবির্ভাবে মেনকার সন্তানবৎসলতার উৎকণ্ঠার সূচনা ; উত্তর-আগমনীতে মাতা ও কন্যার অশ্রুবিগলিত মিলন দৃশ্য। এই নাট্যগীতের প্রথম দৃশ্যে দুটি চরিত্র—মেনকা ও গিরিরাজ ; দ্বিতীয় দৃশ্যে মেনকা ও পার্বতী ; আর অপ্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে আছে জয়া—দুর্গার পিতৃগৃহের সখী। "কৈলাস ও হিমালয়ের এই দুইটি পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া আগমনী ও বিজয়ার গীতিনাট্য হাসি-কান্নায়, আনন্দ-বেদনায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদেরই পটভূমিকায় পতি-পত্নীর গৃহস্থালী, দম্পতির রহস্যালাপ, তাঁহাদের মান-অভিমান, সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলতা, তনয়া বিশ্লেষজনিত দুঃখার্তি, মিলনের আনন্দ, বিরহের বেদনা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। পিতার সংযত ধৈর্য ও ফল্গুধারার ন্যায় অন্তরসলিলা স্নেহ, প্রতিবাসীর সমালোচনা কলকোলাহলও বাদ যায় নাই। পারিবারিক জীবনের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তি, অতিসুকোমল অনুভূতি বিচিত্র রাগিণীতে এখানে ঝঙ্কারময় হইয়া উঠিয়াছে।"[৩]

আগমনী পর্যায়ের কাব্যবিষয়ের বিশ্লেষণে নাটকীয়তার আরও লক্ষণ আছে। মাতৃগৃহে কন্যা আনয়নের জন্যে মাতার ব্যাকুলতা, স্বপ্নদর্শন, স্বামীর প্রতি কাতর অনুনয়, কন্যার সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যের চিন্তায় অকারণ উদ্বেগ, স্বামীর কৈলাসযাত্রা, পিতৃগৃহে আসার আগে শঙ্করের নিকট উমার বিদায় গ্রহণ, মাতা-কন্যার প্রথম সাক্ষাৎ, মান-অভিমান, আনন্দোল্লাস—এ সবই আগমনী পর্যায়ের পর পর সন্নিবিষ্ট দশ্যাবলীর মত। এই দৃশ্যাবলীর চরম পরিণতি বিজয়ায়। বস্তুত আগমনীর অনিবার্য এবং সম্ভাব্য পরিণতি বিজয়া। শাক্তপদকর্তাগণ বিজয়াকে স্বীকার করেই মিলনবিচ্ছেদের এক নিত্যবেদনাভরা বিয়োগান্ত সঙ্গীত রচনা করেছেন নাটকের আঙ্গিকে। অবশ্য বিজয়ার পদে নাটকীয়তা নেই—মাতৃ হৃদয়ের তীব্র আবেগের সকরুণ মূর্চ্ছনার নিরাবরণ প্রকাশে বিজয়ার পদগুলি ভাস্বর। "আগমনীর এই মিলন দৃশ্যটি যেমন সুন্দর, তেমনি মর্মস্পর্শী উমার বিদায় দৃশ্য। মিলনে

আছে বেদনার মধ্যে আনন্দ, কিন্তু বিরহ ও বিরহ-সম্ভাবনার মধ্যে কেবলই বেদনা। ইহা আনন্দ কারুণ্যের নির্ঝর। মাতৃহৃদয়ের দুঃখ ও বিষণ্ণতা মিশাইয়া শাক্ত পদকর্তাগণ বিজয়ার অশ্রু মুক্তাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৪]

আগমনী ও বিজয়ার কাব্যমূল্য :

ক. 'বাংলাদেশের একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশের ভিতরেই আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতের উৎপত্তি'— এই বিশেষ সামাজিক পরিবেশের আলোকে এই পর্যায়ের গীতিপদসমূহের কাব্য মাধুর্য নিহিত।

শাক্তপদাবলীর, বিশেষত আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদসমূহ যে পুরাণের অনুবৃত্তি নয় সে কথাটি Thomson-এর উক্তিতে প্রকাশিত। Thomson-এর মূল্যায়নে এই পদগুলি "In those songs the sorrows of Uma have passed away the region of religion into that of poetry." শাক্তপদাবলীর অন্যান্য পর্যায়ের মতই আগমনী ও বিজয়াতেও একটি তত্ত্ব বর্তমান। তত্ত্বটি হলো শক্তিরূপিণী এবং চৈতন্যরূপিণী দেবী মাতার স্বরূপবস্থিতি ধাম থেকে লীলার টানে মর্ত্যে আগমন এবং লীলা সমাপনান্তে পুনরায় স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তন। চৈতন্য এবং শক্তিরূপিণী দেবীর এই লীলাতত্ত্বের তাৎপর্যের আলোচনা করে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্তসাহিত্য* গ্রন্থে বলেছেন, "ভারতীয় সাধনার পথকে একটি বৃত্তপথ বলা যাইতে পারে। এই বৃত্তের প্রথমার্ধকে বলা যাইতে পারে শূন্যের সাধনা। অপরার্ধকে বলা যাইতে পারে পূর্ণের সাধনা। এই সাধনা শুরু শূন্যতত্ত্ব হইতে, নেতিতত্ত্ব হইতে পূর্ণের দিকে, ইতিতত্ত্বের দিকে। ....যে শক্তি জড় প্রকৃতির মধ্য দিয়ে আমাদের বাঁধিতেছে সে হইল মায়া ; কিন্তু এই শক্তির আর একটি রূপ আছে, সে রূপ যে ভগবদ্ ইচ্ছারূপে কাজ করিতেছে সেই ভগবদ্ ইচ্ছারূপে ক্রিয়াশক্তিই হইল মহামায়া। মহামায়া বাঁধেন না মুক্তি দেন।.....মহামায়া হইল বৃত্তের প্রথমার্ধ। সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের এবং জীবনের সর্বত্র আবার মহামায়ার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ইহাই হইল বৃত্তের অপরার্ধ।....এই মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ, মহামায়াকে আবার মায়ার ভিতর দিয়া বিচিত্র রসে আস্বাদন—এই সাধনার অবলম্বনই বাংলাদেশের উমা।....এই যে মায়া-মহামায়ার মানবী-দেবীর সহজ সমন্বয়— সেই সমন্বয় সাধনার পটভূমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের বাংলা দেশের উমা সঙ্গীত—আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত।" সুতরাং আগমনী-বিজয়ার গানের ধর্মীয় বাতাবরণটি অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ধর্মসঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও আগমনী-বিজয়ার পদগুলি কাব্যগুণে অকিঞ্চিৎকর নয়। সব পদ হয়তো কাব্যোৎকর্ষে সমান নয়—কিন্তু আগমনী ও বিজয়ার মূল সুরটি বাঙালির এতই প্রিয় ছিল যে তার বিষয়গত মাধুর্য আস্বাদনে অধিকারীভেদের ব্যাপারটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিভাহীন অথবা কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন পদকর্তা যিনিই মেনকার আক্ষেপকে সর্বসাধারণের বেদনায় পরিণত করতে পেরেছেন তিনিই আগমনী-বিজয়ার পদকর্তা হিসেবে লোকপ্রিয় হয়েছেন। "আগমনী বিজয়া বাঙলার সর্বপ্রথম ঋতুগীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গান। শরতের শেফালী বনের মর্মের কামনাখানিকে উজাড় করে দিয়ে, ম্লান বিষণ্ণতার রৌদ্রাশঙ্কা থেকে শিশিরকে মুক্ত করে এনে কবিরা ছড়িয়ে দিয়েছেন আগমনী গানে। মাতৃস্নেহকাতর মমতাস্পর্শ-ব্যাকুল একটি গৃহপ্রাঙ্গণে প্রভাতের প্রথম আলোর কমলখানি ফুটিয়ে তোলা ও ঝরিয়ে দেওয়ার লীলাসূত্রে বাঁধা এই আগমনী ও বিজয়া পদগুলি।"[৫]

শাক্ত পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদসমূহ কাব্য-গুণে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ, যদিও এই পর্যায়ে শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ গীতিকারদ্বয়—রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের

রচিত পদ সংখ্যায় অল্প। আগমনী-বিজয়ার পদসমূহে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বের ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের নাগরিক কবিদের প্রাধান্য। এই তথ্য প্রমাণ করে, আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীত মাধুর্য প্রধানত কবিওয়ালাদের নিত্যগীতের অন্যতম হয়ে লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং বিভিন্ন কবিকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। আর এই সব কবিরা কেউ-ই রামপ্রসাদের মতো সাধক-কবি ছিলেন না। সুতরাং এইসব কবিদের রচিত পদে শাক্ত সাধনার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কিছু থেকে থাকলেও তা কখনই সাধক-জীবনের বিশ্বাস থেকে সংক্রামিত হয় না—প্রাক্তন কাব্যের সংস্কার হিসেবে উত্তরাধিকাররূপে তা এসেছে। এই কারণে আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতগুলির কাব্য হয়ে ওঠার পথে ধর্মীয় বাতাবরণ কোন সময় বাধা হয়ে ওঠেনি।

শাক্ত-গীতিকায় আগমনী পর্যায়ের পদের সংখ্যা প্রচুর, বিজয়ার পদ সে তুলনায় অনেক কম। এই প্রাচুর্যের বিভিন্ন কারণ আছে। প্রথমত, শরতের প্রথম আবির্ভাব থেকে শারদ শুক্লপক্ষের বোধন পর্যন্ত আগমনী গানের সময়সীমা—কিন্তু বিজয়ার আয়ুষ্কাল মাত্র দুদিন—নবমী ও দশমী ; দ্বিতীয়ত, আগমনী গানে কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আগমনী পর্যায়ের গানে দুটি স্তবক: পূর্ব-আগমনী ও উত্তর-আগমনী। পূর্ব-আগমনী পর্যায়ে শরৎকাল শুরু হতেই মেনকার উমাকে মাতৃগৃহে আনার জন্যে ব্যাকুলতা, স্বপ্ন-দর্শন, স্বামীর প্রতি কাতর অনুনয় ইত্যাদি বর্ণিত এবং উত্তর-আগমনীতে কন্যা ও মাতার মিলন ও আনন্দোল্লাস। আগমনী গানে এই ঘটনাবলী যেন পরস্পর সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাবলীর ন্যায়—যার চরম পরিণতি বিজয়ার গানে। আগমনী ও বিজয়া গান বাঙালির হৃদয়-মথিত আনন্দবিরহ সঙ্গীত। "আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত কাব্য সম্পদ অযাচিত দৈবপ্রেরণায় যেন বাঙালী কবিদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছিল, তার বিষয়গত মাধুর্য আস্বাদনের জন্য যেন অধিকারীভেদ ছিল না। মাতৃসেবায় যেমন ভক্তের শ্রেণী নির্ণয় করা হয় না, আগমনী বিজয়া পদেও তেমনি প্রতিভাহীন ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পদকর্তা একসূত্রে বাঁধা পড়েছেন। শরত-রৌদ্রপায়ী শিশিরের দ্রুত বিলীয়মান লাবণ্যের মত এক টুকরো উদাসী ভৈরবী রামকেলী ললিত মাখিয়ে অতি সাধারণ সেই পুরাতন পরিচিত মেনকার আক্ষেপটিকে সমগ্র আকাশের মর্মবেদনা করে তুললতে পেরেছেন যিনি, তিনিই আগমনী পদকর্তা। বিজয়া সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা যায়।"[৬]

প্রকৃতপক্ষে আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতগুলি বাঙালি সমাজের ছবি। বাঙালি কবি তাঁর নিজস্ব ভাবনায় উমা, মেনকা, গিরিরাজ, ভোলানাথের চরিত্র এঁকেছেন। চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পৌরাণিক সত্তা হারিয়ে বাঙালির একান্ত পরিচিত চরিত্ররূপে আমাদের আনন্দ-বেদনার অংশীদার হয়ে গিয়েছে। কন্যাবৎসলা মেনকা, স্বভাব-অচল অথচ স্নেহব্যাকুল গিরিরাজ। স্নেহাভিমানী উমা একান্তভাবেই বাঙাল কবির সৃষ্টি। বাঙালি মায়ের সন্তান বাৎসল্য মেনকার মধ্যে চূড়ান্ত গভীরতা ও নিবিড়তা লাভ করেছে। "পারিবারিক চরিত্রগুলির মধ্যে মা মেনকার চরিত্রটিই 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গীতিনাট্যের প্রধান চরিত্র। জননী মেনকার অপার বাৎসল্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের অমর মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। কন্যাসন্তানের জন্য জননীর হৃদয়োত্থিত অশ্রান্ত অশ্রুর ধারায় আগমনী ও বিজয়ার পদাবলী অভিষিক্ত ; গানগুলি অতলান্ত মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আলেখ্য। বালিকা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া জননীর যে দুশ্চিন্তা, তাহাকে কাছে পাইবার জন্য যে দুর্বার আগ্রহ, কাছে পাইয়া মিলনের যে আনন্দ তন্ময়তা, আবার বিদায় দিতে গিয়া যে মর্মস্পর্শী অশ্রুকাতরতা, তাহার পুঙ্খাপুঙ্খ বিশ্লেষণে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় শাক্ত পদাবলীর লীলা-অংশ করুণ মধুর।"[৭] সন্তান বাৎসল্যের আনন্দ ও বেদনার অপরূপ আলেখ্যর বাস্তব চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের লেখায় অনবদ্যভাবে প্রকাশিত : ".....হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলা দেশের একটা বড় মর্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার। একান্ন পরিবারের আমরা দূর ও নিকট, এমন

কি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই—কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। ...আমাদের মিলনধর্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। ....শরৎ সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারি ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাঙলা দেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।" বস্তুত আগমনী-বিজয়ার গানে মেনকা আর উমার মধ্যে বাঙালি আবিষ্কার করেছে বাঙালি ঘরের মাতা আর কন্যাকে। অবশ্য কোন কোন কবি পিতৃগৃহে আগতা উমার মধ্যে সুবর্ণমণ্ডিতা দশপ্রহরণধারিণী ভুবনভোলানো রূপও প্রত্যক্ষ করেছেন:

১. এমনরূপ দেখি নাই কারো মনের অন্ধকার
হরো মা, তোর হর-মনোমোহিনী

২. মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী
দিন যামিনী সমান করেছে।

উপরিউক্ত পংক্তিগুলিতে উমার ভুবনভোলানো রূপ মুগ্ধ কবির দৃষ্টিতে বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে। পংক্তিগুলি কাব্যগুণে রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি*-র অনবদ্য ছত্রগুলিকে মনে করিয়ে দেয় :

ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

একজন পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে, 'Poetry is the speech from soul to soul — মাতৃস্নেহকাতর হৃদয়ে আলোর কমল ফুটিয়ে তোলা আর ঝরিয়ে দেওয়ার লীলাসূত্রে গ্রথিত এই আগমনী-বিজয়ার পদগুলিতে সমালোচকের বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশ নানাভাবে পর্যুদস্ত। দুর্ভিক্ষে-দারিদ্র্যে সর্বাভরণ-ভূষিতা মাতার অঙ্গে লেগেছে মালিন্যের ঝাপ, রিক্ততার ছাপ। সেই ভূষণহীনা রিক্তশোভা জননীর (কন্যারূপে) সন্তানগৃহে ক্ষণিক আগমনকে কেন্দ্র করে বাঙালি কবিরা শারদোৎসবে তার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে ক্ষণিকের জন্যে হলেও আনন্দসাগরে ডুব দেয়। যে সম্পদ অচিরস্থায়ী তাকে ধরে রাখার আকুল কামনায় বাঙালি কবিরা যে আগমনী গান গেয়েছেন বিষয়বস্তুর মর্যাদায় তা অপূর্ব। আবার অচিরস্থায়ী সম্পদের অনিবার্য তিরোধানই বিজয়া সঙ্গীতের মূল সুর। বহু কবির কাব্যে বিজয়ার রাগিণী করুণ মুর্ছনায় বেজে উঠেছে।

১. যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত
আর যেন উদয় না হয় দীননাথ
এ ভিক্ষে চরণে।

২. যেওনা রজনী আজি লয়ে তারাদলে।

৩. ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান।

আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের কাব্যগত উৎকর্ষের মূল কারণ এই গানগুলি বাঙালি জীবনের উৎসব সঙ্গীত হয়ে উঠতে পেরেছে—যে উৎসবে বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে সানাই-এর সুর বেজে ওঠে, যে-উৎসবে প্রবাসী ঘরে ফিরে আসে, যে উৎসবে কন্যার পিতৃগৃহে আগমনে পিতৃগৃহ আনন্দমুখর হয়ে ওঠে—আগমনী গান সেই উৎবেরই বোধনসঙ্গীত আর বিজয়া সেই অকালসমাপ্তি উৎসবের নশ্বরতার বিলাপ, স্বপ্নচ্যুত জীবনের করুণ রাগিণী।

এই পর্যায়ের পদের বাণীরূপ বিচার করার আগে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, পাঠ্য কবিতা হিসেবে নয়, সঙ্গীতের অঙ্গিকেই ঐ পদগুলি লেখা হয়েছিল। পাঠ্য কবিতার বন্ধন

সেগুলির মধ্যে দেখা যায় না—সুরপ্রবাহকে কথার বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা যায় না। আগমনী ও বিজয়া পর্বের পদসমূহ সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। ভাষার দিক থেকে আগমনী ও বিজয়ার পদগুলি যথেষ্ট ঐশ্বর্যমণ্ডিত না হলেও বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত এই পদগুলির ভাষা বেশ সরল এবং আন্তরিকতাপূর্ণ :

গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবারে মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।।

পদটি সহজ ভাষায় রচিত—স্বভাবতই সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার ব্যাপারে এ জাতীয় ভাষার বিশেষ ভূমিকা আছে। পরিশীলিত চিত্ত না হলেও কবিতার মূল রস অনাস্বাদিত থাকে না।

গিরি গৌরী আমার এল কৈ?
ঐ যে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে হেসে,
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই।

উপরিউক্ত পংক্তিগুলি কবিতায় মৌখিক ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। কিন্তু মৌখিক ভাষার প্রয়োগে কবিরা সর্বক্ষেত্রে সার্থক নন। বস্তুত তৎসম শব্দ, মৌখিক শব্দ ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহারে পদগুলি অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সৌন্দর্য হারিয়েছে। কারণ বেশিরভাগ কবির রুচি ও শিক্ষা এমন কিছু উন্নতমানের ছিল না যাতে ভাষার সমৃদ্ধি সাধন সম্ভব হয়। কিন্তু কিছু কিছু পদের সরল অভিব্যঞ্জনার উৎকর্ষকে স্বীকার করতেই হয়।

শাক্তপদাবলী মূলত সঙ্গীত রূপেই গ্রহণীয়। পাঠযোগ্য কবিতা না লিখে পদকর্তারা গান রচনা করেছেন বলে প্রচলিত ছন্দের কাঠামো আগমনী-বিজয়ার পদগুলিতে নেই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিদের পদ বিনা সুরে রচিত হলেও পরবর্তীকালে সুর আরোপিত হয়েছে। মধুসূদনের 'যেওনা রজনী আজি লয়ে তারাদলে'—এই সনেটটিতে তানপ্রধান পয়ার-এর রূপটি অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু এটি যথার্থ অর্থে শাক্ত-সঙ্গীত নয়। শাক্ত পদাবলী সুরপ্রধান হওয়ায় নবীনচন্দ্র সেন যিনি স্বভাবে গায়ক বা সুরকার নন তিনিও 'যেওনা নবমী রজনী' পদটি গানের ছন্দে রচনা করেছেন। কবিতার ছন্দের দিক থেকে শ্বাসাঘাতপ্রধান, শ্বাসাঘাতপ্রধান মিশ্রিত তানপ্রধান এবং অস্পষ্টভাবে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পদও দেখা যায়।

এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
(এবার)মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানব না।

মধ্যযুগে পয়ার বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দই ছিল প্রায় একমাত্র ছন্দ। শাক্তপদাবলীতে এই ছন্দের ব্যবহার আছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারও লক্ষণীয় :

(আর) জাগাস নে মা জয়া অবোধ অভয়া
কত করে উমা এই ঘুমালো
(মা) জাগলে একবার ঘুম পাড়ানো ভার
(মায়ের) চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।

আগমনী ও বিজয়ার গীতগুলিতে অলঙ্কার ব্যবহারের অপ্রতুলতা লক্ষ করা যায়। অবশ্য সব রকম অলঙ্কারের কিছু কিছু ব্যবহার আগমনী-বিজয়ার পদগুলিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। যেমন—

গিরি গৌরী আমার এল কৈ [অনুপ্রাস]
সোনার পুতলি দিলে পাথরে ভাসায়ে [অতিশয়োক্তি]
ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান [সমাসোক্তি]

কিছু সুন্দর চিত্রকল্প সৃষ্টিতে পদকর্তারা বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন :

সুনীল আকাশে ঐ শশি দেখি
কৈ গিরি আমার কৈ শশিমুখী?
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি,
বল বল আমার কোথা বর্ণময়ী?

চিত্রকল্পটিতে বিশ্বশক্তির মূলীভূত শক্তি উমার স্নিগ্ধরূপ বর্ণিত।

শাক্তপদাবলীর উমাসঙ্গীতের ধারায় কবিরা বাৎসল্য রসের যে চিত্র এঁকেছেন তা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। কন্যাকে ঘিরে মাতৃহৃদয়ের আনন্দ-বেদনা আগমনী বিজয়ার গানগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাঙালি জীবনের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

● আগমনী ও বিজয়ার পদে পারিবারিক ও গার্হস্থ্য চিত্র :

ক. "আগমনী ও বিজয়া গানকে কেবলমাত্র ধর্মীয় গীত হিসাবে না দেখে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে মা ও মেয়ের সম্পর্কের বাস্তব ও স্পর্শকাতর জীবনচিত্র বলাই অধিক সঙ্গত।"

খ. "এগুলির রঙ্গভূমি বস্তুত কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে। প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহাদের অনুভূতি ক্ষেত্র।"

গ. 'আগমনী' ও 'বিজয়া' পর্যায়ের পদে হিমালয় ও মেনকার গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় ও জীবনচিত্রে তৎকালীন বাস্তব জীবনের পরিচয়।"

ঘ. "পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত হলেও আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনেরই সঙ্গীত।"

ঙ. "বাংলার আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে শক্তিসাধনা ও ভক্তিবাদকে অতিক্রম করে বড় হয়ে উঠেছে মানবিক আবেদন।"

আগমনী-বিজয়ার অন্তর্নিহিত মাধুর্য ও মানবিক আবেদনের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে :

> "কাল দুর্গোৎসব ; আজ তার সুন্দর সূচনা। ঘরে ঘরে দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে আমাদের ধর্মসংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে।.....এমনি করে প্রতি বৎসর কিছু কালের জন্য মনের এমন একটা অনুকূল আর্দ্র অবস্থা আসে যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে ; আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয় সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দ কাব্য রচনা করে।"

কন্যা এবং মাতার মধ্যে স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাংলার উমাসঙ্গীত বা আগমনী-বিজয়ার গান। অবশ্য আগমনী-বিজয়া গানের একটি পৌরাণিক পটভূমি আছে। মেনকা-উমা—এঁরা পৌরাণিক চরিত্র। বিভিন্ন পুরাণে সতীর দেহত্যাগের কথা আছে। দেহত্যাগের পর সতী হিমালয়-মেনকার গৃহে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন—এই সময় তাঁর নাম হয় উমা। উমার সঙ্গে শিবের বিবাহ এবং কার্তিক-গণেশরূপী পুত্রদের কথাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। সপ্তমী-অষ্টমী-

নবমীতে দুর্গাপূজার বিধান এবং দশমীতে বিজয়া তথা বিসর্জনের বিধানও শাস্ত্রসম্মত। বাঙালি কবিরা পৌরাণিক এই পটভূমিকে কাজে লাগিয়েছেন বাঙালির নিজস্ব কাব্য রচনায়। বাঙালি কবির সৃষ্টিতে উমা সাধারণ বাঙালি কন্যা যিনি দীর্ঘকাল স্বামীগৃহে থাকায় শোককাতরা মেনকা স্বামীকে কৈলাসধামে পাঠালেন কন্যাকে স্বগৃহে আনতে। কন্যার আগমনে হিমালয়-গৃহ আনন্দে উদ্ভাসিত হল—মাতা-কন্যার মান-অভিমান এবং কুশল-মঙ্গল আদান-প্রদানের মধ্যে তিনটে দিন—সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী অতিবাহিত হল। দশমীর প্রভাতে পিতৃগৃহ অন্ধকার ক'রে মেনকাকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত ক'রে উমা আবার পতিগৃহে যাত্রা করলেন। এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন পদকর্তারা উমাসঙ্গীত বা আগমনী-বিজয়ার গান রচনা করেছেন।

পৌরাণিক পটভূমি ছাড়াও নানা সাহিত্যিক ঐতিহ্যসূত্রে শাক্ত-গীতিকারেরা আগমনী-বিজয়া গানের বিষয়বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রকীর্ণ কবিতায় প্রাপ্ত হর-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের আলেখ্য, হিমালয়াত্মজার পিতৃগৃহে আগমন ইত্যাদি ঘটনা শাস্ত্র-গীতিকারদের উদ্দীপ্ত করেছিল আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত রচনায়। এই সকল সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা থেকে সম্ভবত শাস্ত্রকাররা মেনকার খেদ, সন্তানের মাতৃঅভিমান, মাতৃনির্ভরতা, সংসার-উদাসীন দরিদ্র-শিবের জীবন চিত্রের আভাস পেয়েছিলেন যা তাঁরা নিজেদের কাব্যের কায়াগঠনে কাজে লাগিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন পুরাণতন্ত্র ও পুরাণাশ্রিত সাহিত্য—শ্রীশ্রীচণ্ডী, চণ্ডীশতক, আনন্দবর্ধনের দেবীশতক, শঙ্করাচার্যের রচনাবলী ইত্যাদি শাক্তপদাবলীর গঙ্গোত্রীস্বরূপ। পুরাণের পটভূমিটি তাই মাঝে মাঝেই আগমনী-বিজয়ার গানে আভাসিত হতে দেখা যায়। বাংলার শক্তি উপাসনার ধারার এক প্রান্তে আছে পৌরাণিক দুর্গা, যিনি গিরি-দুহিতা দুর্গতি-নাশিনী পার্বতী ; যিনি একই সঙ্গে দশমহাবিদ্যা আবার অসুরনাশিনী চণ্ডী, আর অন্যদিকে তিনিই কালিকা। আগমনী পদেও এই পৌরাণিক বিশ্বাসের প্রকাশ দেখা যায়। কমলাকান্তের পদে মেনকা স্বপ্ন দেখেছেন :

আর শুন অসম্ভব চারিদিকে শিবারব হে।
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে।।

হরিশচন্দ্র মিত্রের একটি পদে :

বাছার আমার নাই সে বরণ নাই আভরণ
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালির বরণ।

পতিগৃহে অযত্নে উমার সোনার বর্ণ কালো হয়েছে—পঙক্তিদ্বয়ে সাধারণভাবে এই অর্থ বোঝালেও দুর্গা আর কালিকা যে এক—গূঢ়ার্থে সেই ব্যঞ্জনাই এখানে প্রকাশিত।

প্রকৃতপক্ষে আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতগুলি পুরাণের পটভূমিকায় বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের ছবি। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে তাঁর *লোকসাহিত্য* গ্রন্থের 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন—"হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলাদেশের একটা বড়ো মর্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার ; কন্যাদায়ের মতো দায় নাই। সমাজের অনুশাসনে নির্দিষ্ট বয়স এবং সঙ্কীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সেই কৃত্রিম তাড়নাবশতই বরের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তাহার রূপগুণ অর্থসামর্থ্যে আর তত প্রয়োজন থাকে না। কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা, ইহা আমাদের সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতা পরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্মবেদনা, সর্বদাই ঘরে ঘরে উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। একান্নবর্তী পরিবারে আমরা দূর ও নিকট, এমনকি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই ; কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। যে সমাজে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত পুত্রকন্যা প্রভৃতি সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়

তাহারা আমাদের এই দুঃসহ বেদনা কল্পনা করিতে পারিবে না। আমাদের মিলনধর্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। হরগৌরীর কথা বাংলার একান্ন পরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা।"

আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতগুলি পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত হলেও, শুধুমাত্র পৌরাণিক পটভূমিকার জন্যেই মানবচিত্তে এই সঙ্গীতগুলির আবেদন সুচিরস্থায়ী নয়। এগুলির উৎকর্ষগত সৌন্দর্য অন্যত্র নিহিত। শুধুমাত্র ধর্মীয় সঙ্গীতরূপে এগুলি বিচার্য নয়, মাতা-কন্যার সম্পর্কের এমন বাস্তব ও স্পর্শকাতর চিত্র বিশ্বসাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ। আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের মর্মকেন্দ্রে একটি বিশেষ সম্প্রদায়গত ধর্মদর্শন থাকলেও সঙ্গীতগুলি বিচার্য কিন্তু সমকালীন গার্হস্থ্য ও সমাজ জীবনের অনির্বচনীয় কাব্যগত প্রকাশের জন্যে। এদের উৎসভূমি কৈলাস বা হিমালয়পুরী নয় ; প্রতি গৃহস্থের হৃদয়ই যেন আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের গঙ্গোত্রী। এখানে বাঙালির পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের কথা করুণ-মধুর রাগিণীতে বেজে উঠেছে। কন্যার প্রতি পিতা-মাতার বাৎসল্য, তার বিবাহের জন্যে দুশ্চিন্তা, বিবাহের পর স্বামীগৃহে কন্যার দুঃখদারিদ্র্যের কথা চিন্তা করে মাতৃ-হৃদয়ের অন্তহীন ব্যাকুলতা, কন্যাকে দেখার জন্যে মাতৃ অন্তরের অপরিসীম আগ্রহ ইত্যাদি সমস্তই যেন একাত্মভাবে বাঙালির গার্হস্থ্য চিত্র। "শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' অংশে কন্যা বিরহাতুরা জননীর সংশয়, প্রতীক্ষা ও অশ্রুবেদনার কাহিনী। আগমনীর শেষাংশ মা ও মেয়ের মিলনজনিত অন্তর-মথিত আনন্দ বেদনার চিত্র। 'বিজয়া' অংশ উমার পতিগৃহ যাত্রার বিষয় অবলম্বনে মা মেনকার মর্মস্পর্শী দুঃখার্তির বর্ণনা। বস্তুতঃ শাক্তপদাবলীর লীলাপর্ব পৌরাণিক কাহিনীর গার্হস্থ্য রসসিক্ত সঙ্গীতময় বাণীরূপ।"[৮] শাক্তপদাবলীর আগমনী-বিজয়া অংশের সঙ্গীতগুলিতে বাঙলাদেশের সুপরিচিত গার্হস্থ্য জীবনসঙ্গীতই ধ্বনিত হয়েছে। মাতা-পিতা সন্তানকেন্দ্রিক বাংলাদেশে যে গার্হস্থ্য পারিবারিক জীবন নানা সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় বিচলিত সেখানে প্রতিবেশীরাও যুক্ত। শাক্তপদাবলীতে সেই বৃহৎ সংসারের রূপ চিত্রিত। আগমনী-বিজয়া অংশের সঙ্গীতগুলি গড়ে উঠেছে কৈলাশপুরী ও শিবপুরীকে কেন্দ্র করে। দুটি সংসারের গৃহস্থালি, হাসি-কান্না, মান-অভিমান, দম্পতির রহস্যালাপ, সন্তানের জন্যে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতগুলি উদ্বেলিত। আগমনী-বিজয়ার কাহিনী পুরাণের কাহিনী, চরিত্রগুলিও দেবদেবীচরিত্র, কিন্তু কাহিনী ও চরিত্র উভয়েরই মানবায়ন ঘটেছে। পৌরাণিক আখ্যায়িকা বাঙালি জননীর অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয়ে বস্তুজগতের পারিবারিক ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আগমনী পর্যায়ের কয়েকটি স্মরণীয় পদে দেবীদুর্গার মর্ত্যে আগমন উপলক্ষে প্রিয়তম উৎসবের ক্ষণস্থায়ী মিলন-মাধুর্য ধর্মসংস্কারের গণ্ডি অতিক্রম করে মানবহৃদয়ের চিরন্তন স্নেহকোমলতা বৃত্তির বিষয়ীভূত হয়েছে। সর্বভারতীয় শাক্তসাধনা আগমনী-বিজয়ার গানে একান্তভাবেই বাঙালির নিজস্ব গার্হস্থ্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

"আগমনী পর্যায়ের দুটি স্তবক, একে পূর্ব-আগমনী ও উত্তর আগমনী বলা যেতে পারে। পূর্ব আগমনী পর্যায়ে শারদ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মেনকার কন্যাবৎসলতার উৎকণ্ঠার উদ্‌গম। স্বামী স্থানুকল্প হিমাচলের প্রতি কন্যা-আনয়নের ব্যাকুল অনুরোধ এবং উত্তর-আগমনীতে মাতা ও কন্যার মুগ্ধললিত অশ্রুগলিত মিলন দৃশ্য। এই দৃশ্যকাব্যের প্রথম দৃশ্যে দুটি চরিত্র, মেনকা ও গিরিরাজ; দ্বিতীয় দৃশ্যে মেনকা ও পার্বতী। অন্যান্য অপ্রধান পাত্রপাত্রীর মধ্যে আছে জয়া—দুর্গার পিতৃগৃহের সখী। মেনকার দুর্ভাগ্য-পীড়িত ললাটে কন্যার স্বামীগৃহ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন চিন্তা ; জামাতা ভোলানাথের সংসারবৈরাগ্য ও কন্যার পারিবারিক অসচ্ছলতা মাতার অন্তর ব্যাকুলতার কারণ। বাঙালি কবিদের হাতে সব চরিত্রগুলিই আমাদের চতুষ্পার্শস্থ বাঙালি সমাজের পরিচিত চরিত্র, কিন্তু জ্ঞানতান্ত্রিক কবিদের উল্লেখে উমা-মহেশ্বরের পৌরাণিক রূপটিও থেকে থেকে দৃষ্টিগোচর হয়।

শিবের অভাব-পীড়িত সংসার ও শ্মশান-চারিতা, দাম্পত্য কলহ, জটাজুটধারী সর্পাভরণ-ভূষিত ভস্মাচ্ছাদিত দেহ এইগুলি পুরাণে সংস্কৃত কাব্য কবিতায় পূর্বচিত্রিত, সুতরাং এই চিত্রায়ণে কবিদের অভিনবত্ব নেই। কিন্তু কন্যাবৎসলা মেনকা, স্বভাব-অচল অথচ স্নেহব্যাকুল গিরিরাজ, স্নেহাভিমানী উমা একান্তই বাঙালী কবির সৃষ্টি।"[৯]

'আগমনী' পর্যায়ের কয়েকটি পদে বাঙালি জননীর চিরকালীন বাসনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মেনকা উমাকে আর পতিগৃহে পাঠাতে চাননা, তাতে সামাজিক নিন্দা যদি বরণ করে নিতে হয় তাও স্বীকার্য—'গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না/বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না।' সাধারণ জননীর ন্যায় মেনকা উমাকে স্বপ্নে দর্শন করেন—'বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ, হেমাঙ্গী হইয়াছে কালী বরণ।' প্রাণের কন্যা উমার মঙ্গল সংবাদ না পেয়ে বিচলিতাচিত্তা মেনকা হিমালয়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ করেন—'তুমি তো অচল পতি, বল কি হইবে গতি/....না ভাব তাহার জন্য তুমি একবার।' বাংলাদেশের এই উমাসঙ্গীতের প্রসঙ্গে এমন বলা যেতে পারে যে, দেবমহিমার অন্তরালে এখানে হয়তো মর্ত্যজীবনের দুঃখদারিদ্র্যের চিত্রকে আবৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে অথবা দেবমহিমার আবরণে গভীর দুঃখকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণ মর্ত্যজননীর ন্যায় মেনকা কন্যা উমাকে রাত্রে স্বপ্নে সন্দর্শন করেন, উমার কথা বলতে বলতে নয়নদ্বয় অশ্রুবারিতে নিষিক্ত হয়, অন্তর বেদনায় দীর্ণ হয়। সংসারধর্ম পালন তাঁর কাছে অসার বলে মনে হয়। উমাকে দেখার জন্যে মেনকার প্রাণ ব্যাকুল হওয়ায় মেনকা গিরিরাজের বিরুদ্ধে অনুযোগ উপস্থাপিত করেছেন। ভাগ্যদোষে নারী জন্ম হওয়ায় মেনকা নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেন যে, নারীর জন্ম শুধুই যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে—'নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে'। মেনকা গিরিবরকে অনুরোধ করেন—উমা কেমন আছে তার খবর নিতে ; কঠিন-হৃদয় গিরিরাজ জামাতার রীতি জানেন—'জান তো জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত, পরিধান বাঘাম্বর, শিরে জটাভার'। কমলাকান্তের একটি পদে মাতৃহৃদয়ের বেদনা অপরূপ অভিব্যক্তি লাভ করেছে—উমার বিধুমুখ না দেখে মেনকার ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়। উমাকে আনতে না পারার জন্যে মেনকা নিজেকে ও গিরিরাজকে ধিক্কার জানাচ্ছেন—'ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে জীবনে কি সাধ আর।' উমাও সাধারণ বাঙালি কন্যার মত পিতৃগৃহে গমনের জন্যে স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করেন—তিন দিন পরে যে প্রত্যাগমন করবেন সে কথা জানাতেও ভোলেন না। শিবও সাধারণ মানুষের মত উমাকে পিতৃগৃহে গমনের অনুমতি দেন এবং স্বয়ং উমার সঙ্গে যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন।

অবশেষে উমা মেনকার গৃহে আসেন। মাতা মেনকা প্রাণের উমাকে দর্শন করে কৃতার্থ হন। উমার মুখশশী দেখে মেনকার দুঃখরাশি দুঃখ হয়। উমার আগমনবার্তা শ্রবণে অশ্রুপরিপ্লাবিত নয়নে, আলুলায়িত কুন্তলে, অসম্বৃত বসনে মেনকা উমাকে গৃহে আনার জন্যে দ্রুত ধাবিত হন। উমার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে, চুম্বন করে দিগম্বরের হাতে সম্প্রদানের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। সহচরীরা এসে উমার সঙ্গে আনন্দোৎসব করে, কুশল বিনিময় করে। মর্ত্যমমতাসিক্ত মাতৃহৃদয় আর্তিতে বেদনায় চিরন্তন মাতৃস্বরূপে আরও নিবিড়ভাবে বিকশিত হয়। শুধু মাতা-কন্যার হৃদয় বেদনাই নয়, প্রতিবেশীদের আনন্দও শাক্তপদাবলীর অনেক পদে প্রকাশিত হয়েছে বলে একে বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গীত বললে অত্যুক্তি হয় না। কমলাকান্তের একটি পদে ('আমার উমা এলো বলে রানী এলোকেশে ধায়') উমা-মেনকার বিরহ চিত্রের পরিবর্তে প্রতিবেশী রমণীবৃন্দের প্রতিক্রিয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কমলাকান্তের আর একটি পদে ('শরত কমলমুখে আধ আধ বাণী মায়ের') শিবের দৈবী মহিমার প্রকাশ ঘটলেও মানবিক অভিজ্ঞতার প্রকাশও দুর্লভ নয়। মাতা

মেনকার মাধ্যমে বাঙালি মায়ের চিরন্তন ভাবনার কথা যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি উমাও প্রথা অনুযায়ী চিরপরিচিতা কন্যার ন্যায় স্বামীর গুণগান করে মায়ের চিন্তা দূর করতে প্রয়াসী।

লীলাপর্বের পারিবারিক আলেখ্য 'আগমনী' অংশে বাংলাদেশের অতিপরিচিত পারিবারিক আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। গার্হস্থ্যভাব প্রধান হওয়ার জন্যে মহাদেব, উমা, হিমালয়, মেনকা সকল চরিত্রই মানবিক গুণে বিমণ্ডিত। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের পত্নী ও কন্যা রূপে মহামায়া চরিত্রটিও অলৌকিকত্ব এবং দৈবীমহিমা বিবর্জিত হয়ে একান্ত পরিচিত বস্তুজগতের মানবী হয়ে উঠেছে। উমা কর্তব্যপরায়ণা, মাতৃবৎসলা, অভিমানী কন্যা ; মাতৃস্নেহে, পিতৃকর্তব্যে উমা কর্তব্যপরায়ণা। গিরিরাজ হিমালয়ও পরিবারের কেন্দ্রীয় কর্তা রূপে যুক্তিবাদী, সংযত, ধৈর্যশীল পুরুষ। তিনি অকারণে বিচলিত হন না। তিনি বুদ্ধিমান, বিচারশীল ও মনস্তত্ত্বজ্ঞ। "পারিবারিক চরিত্রগুলির মধ্যে মা মেনকার চরিত্রটিই 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গীতিনাট্যের প্রধান চরিত্র। জননী মেনকার অপার বাৎসল্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের অপার মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। কন্যাসন্তানের জন্য জননীর হৃদয়োত্থিত অশ্রুর ধারায় আগমনী বিজয়ার পদাবলী অভিষিক্ত, গানগুলি অতলান্ত মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আলেখ্য। বালিকা-কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া জননীর যে দুশ্চিন্তা, তাহাকে কাছে পাইবার, জন্য যে দুর্বার আগ্রহ, কাছে পাইয়া মিলনের যে আনন্দ তন্ময়তা আবার বিদায় দিতে গিয়া যে মর্মস্পর্শী অশ্রুকাতরতা তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় শাক্ত পদাবলীর লীলা অংশ করুণ মধুর। ***পারিবারিক দৃশ্যের মধ্যে মা মেনকা ও মেয়ে উমার মিলন দৃশ্যটি সাহিত্যে অনুপম। বিরহ-কাতর জননীর সহিত স্নেহের দুলালী কন্যার মিলন দৃশ্যে মাতৃহৃদয়ের আনন্দবেদনা ও অতিসূক্ষ্ম মনোভাব অতিনিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। শাক্তপদাবলীর কবিগণ হৃদয় ঢালিয়া এই দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। এই মিলনচিত্র নির্মল শুভ্র পবিত্র ; ইহা অশ্রু পরিশুদ্ধ, অনন্ত মাধুর্যে মণ্ডিত ; ইহা আবেগে উচ্ছল, বাৎসল্যে গদগদ। একদিকে কন্যা মিলন-প্রয়াসী জননীর ব্যাকুলতা, অন্যদিকে মাতৃস্নেহ-পিয়াসী কন্যার সুতীব্র আগ্রহ ; উভয়ে মিলিয়া যেন এই ধরণীর ধূলিতে এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। বাঙালীর ঘরোয়া চিত্রের অনুকরণে এই দৃশ্য পরিকল্পিত হইলেও এই মিলনচিত্রের আবেদন সর্বজনীন।"[১০]

'আগমনী' অংশে মাতা-কন্যার মিলন দৃশ্য যেমন মাধুর্যে-মাতৃপ্রেমে অনন্য, বিজয়ার বিদায় দৃশ্য তেমনি মর্মস্পর্শী বেদনার হৃদয়নিঃসৃত বাণী-বন্দনায় মৌন। 'বিজয়া'য় শুধুই বিরহ, অনন্ত বিচ্ছেদ—'ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান'—পদটিতে আসন্ন বিচ্ছেদ কল্পনায় মেনকার বেদনার অভিপ্রকাশ এবং নবমীর রাত্রিকে প্রাণদাত্রীরূপে কল্পনা করে তাকে চলে না যাওয়ার জন্যে নিবেদন জ্ঞাপনে মেনকা স্নেহময়ী চিরকালীন বঙ্গজননীরূপে অঙ্কিতা। নবমী "রজনীকে উপলক্ষ্য করিয়া মাতৃহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন অনর্গলিত হইয়া জনমনকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করিয়াছে। বিরহের সকরুণ আর্তনাদে নবমী রজনীর স্বর্ণ-দীপাবলী ম্লান হইয়া গিয়াছে, ইহার বাতাস মন্থর হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের সকল আকাঙ্ক্ষা একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া কেবল প্রার্থনা করিয়াছে।"[১১]

যেয়ো না রজনি-আজি লয়ে তারা দলে
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

নবমী নিশি অবসিত হলে দশমীর প্রভাত আরও করুণ হয়ে দেখা দেয়। শিবের ঘন ঘন ডমরু ধ্বনিতে মাতৃহৃদয় বিদীর্ণ ; বেদনার্ত মেনকা শিবকে সর্বস্ব দিতে পারেন, কিন্তু উমাকে দিতে পারেন

না—'ভিখারী ত্রিশূলধারী, যা চাহো তা দিতে পারি'—পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠানো যায়।' কিন্তু গৌরীকে তবু পাঠাতে হয়— যে মাটির কন্যার আগমনী গান সেদিন বেজেছিল আজ বিজয়ার গানে তার বিদায়—শ্মশান বাসী পাগলের আবির্ভাব হয়েছে, মেঘের ডমরু ঘন ঘন বেজে উঠেছে। বিজয়ার করুণ রাগিণীতে বিশ্বজীবনের চিরন্তন লীলাতত্ত্ব আভাসিত হয়েছে তারই পরিচয় আছে নিম্নোদ্ধৃত অংশে :

> "মূল শক্তিরূপিণী ও চৈতন্যরূপিণী দেবী উমা শিবধাম কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরে একবার পিতৃগৃহ গিরিপুরে আসেন। কৈলাস শিবধাম— মায়ের স্বরূপাবস্থিতির ধাম। সেখান হইতে স্নেহ-প্রেম বিগলিত হইয়া মা নামিয়া আসেন গিরিপুরে—প্রেমসৌন্দর্যের দেশে—মাতা মেনকা এবং পিতা হিমালয়ের স্নেহনীড়ে। স্বরূপের দেশ হইতে স্বামীর অঙ্গে লীলা মাকে যখন জ্ঞানমাত্রতনু নির্গুণ ভোলানাথের অবিনাভাব হইতে খানিকটা যেন একটু পৃথক করিয়া দূরে সরাইয়া লীলার দেশে নামাইয়া আনা গেল তখন মর্ত্যের কবিগণ সাহসী হইয়া আরও একটু আগাইয়া গেলেন ; তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তি ও কবিকল্পনার বলে মাকে তাঁহাদের হৃদয়-দোলায় স্থাপিত করিয়া অত্যুচ্চ গিরিপুর হইতে একেবারে সমতল নিম্নভূমি বাঙলাদেশের দিকে রওনা হইলেন এবং শরতের সোনার আলোকে জলের কমল-কুমুদ-কহ্লার এবং স্থলের শেফালির বর্ণগন্ধের স্নিগ্ধ সমারোহের মধ্যে শিশিরসিক্ত বাঙলার কুটির-প্রাঙ্গণে সেই হৃদয়ের দোলা আসিয়া নামিল বাঙলার লক্ষ লক্ষ কুঁড়েঘর হইতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পাষাণী-মা ও পাষাণ-পিতা বাহির হইয়া প্রতিবেশীর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সেই কৈলাসের উমাকে আড়ম্বর-আয়োজনহীন মাটির ঘরে বরণ করিয়া লইল। বাহিরের কঠোর দারিদ্র্য আর অন্তরের অফুরন্ত প্রাচুর্য মিশিয়া গিয়া একটি অভিনব প্রতিবেশের সৃষ্টি করিল, সেই প্রতিবেশের ভিতরে সকলে চাহিয়া দেখিল কৈলাসবাহিনী মা ভবানী সহসা কেমন স্মিত-হাস্যে ভাঙা কুটির আলো করিয়া স্নেহের দুলালী রূপ ধারণ করিয়া বিরাজমানা—তিনি একাধারে দেবী হইয়া মানবী আবার মানবী হইয়া দেবী। আশ্চর্য তাঁহার সেই রূপ—দেবীতে আর মানবীতে—স্বরূপে আর রূপে—কোথায় যে ভেদ কিছুই আর বুঝিয়া ওঠা যাইতেছে না। মা স্বরূপ হইতে রূপে—প্রেমলীলার ক্ষেত্রে—আগমন করিলেন বাঙালী প্রাণ ভরিয়া আগমনী গান গাহিল ; দশমী দিনে মা আবার প্রেমলীলার ক্ষেত্র ছাড়িয়া স্বরূপের দেশে যাত্রা করিলেন, রসপিপাসু বাঙালীর চোখ বিরহ-বেদনায় সিক্ত হইয়া উঠিল, চোখের তারার ধারায় ভিজাইয়া তাহারা কৈলাসগামিনী তারার গান গাহিল—তাহাই বিজয়া সঙ্গীত।"[১২]

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও এই তত্ত্বের সম্যক্ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর *বিচিত্র প্রবন্ধ* গ্রন্থের 'শরৎ' প্রবন্ধে—"আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নতুন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়, তাই ধরার আঙিনায় আগমনী গানের অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।"

আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত ধর্মীয় বা পৌরাণিক পটভূমির উপর রচিত হলেও সেখানে উভয় পটভূমিই ম্লান হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে মুখ্যরূপে ব্যক্ত হয়েছে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার চিত্রের মধ্যেও অনাবিল আনন্দের মধুর সুন্দর প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতধর্মিতা। আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রই

প্রকাশিত হয়েছে। "আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতরস্নেহ, বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসবে পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান।"[১৩]